সাদ্দামের ফাঁসি এবং স্বদেশ ভাবনা

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

আমেরিকার পুতুল সরকার একটি প্রহসনমূলক ও অস্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে মৃত্যুদন্ড দেয় এবং গত ৩০ ডিসেম্বর পবিত্র ঈদের দিন ভোর ৬টা পনের মিনিটে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। তাঁর ফাঁসিতে বিশ্বজুড়ে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রতিরোধ যুদ্ধের নেতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার ইতিহাস অনেক পুরানো, যেমন পুরানো এই ঐতিহাসিক সত্যটি যে এভাবে ফাঁসি দিয়ে দখলদারেরা কখনোই তাদের শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ইতালী দখলদারদের বিরুদ্ধে লিবিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী স্কুল শিক্ষক ওমর মোখতারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে লিবিয়ার স্বাধীনতা ঠেকানো যায় নি। ১৮৫৭ সালে শহীদ রজব আলীসহ আমাদের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়কদেরকে দখলদার ইংরেজরা একইভাবে হত্যা করেছিল। কিন্তু তাতে স্বাধীনতার সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া যায় নি। তবে অন্য সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদের থেকে সাদ্দাম হোসেনের কিছু পার্থক্য রয়েছে। যারা তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে, তিনি তাদের ফাঁদে পা দিয়েই তাঁর শাসনামলের অধিকাংশ ভুলগুলো করেছিলেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাদ্দামের ফাঁসি আমাদের রাজনীতিক, সুশীল সমাজ ও মিডিয়ার জন্য সতর্কতা সংকেত নিয়ে এসেছে।

যে মার্কিনিদের হাতে আজ সাদ্দামকে জীবন দিতে হলো, তাদেরকে তিনি নিজের বন্ধু ভেবেছিলেন। ১৯৭৯ সালের ১৬ই জুলাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার এক বছরের মাথায় ১৯৮০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর সাদ্দামকে দিয়ে প্রতিবেশী দেশ ইরান আক্রমণ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিনি পুতুল শাহ সরকারকে ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে পতন ঘটানোর প্রতিষোধ ও ইসলামি বিপ্লবকে অংকুরেই বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা এ যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। আট বছরব্যাপী এ যুদ্ধে ইরানের ১৫ লক্ষ নাগরিক নিহত হন। এ যুদ্ধে আমেরিকা সাদ্দামকে অস্ত্র, অর্থ সবকিছু দিয়ে সাহায্য করে। ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সাদ্দামকে দেয়া হয় রাসায়নিক বোমার প্রযুক্তি ও কাঁচামাল। শুধু তাই নয় আমেরিকার প্ররোচনায় নিজ দেশের শিয়া ও কুর্দীদের উপরও উপরও তিনি হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন।

ইরান যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিনের মধ্যে সাদ্দাম আবার পা দেন মার্কিন ফাঁদে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইরাক তার কুয়েত সীমান্তে বিপুল সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। এ খবর জানাজানি হলে আরব বিশ্ব দেশ দুটির মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে দ্রুত উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তারই মধ্যে ১৯৯০ সালের ২৫শে জুলাই ইরাকে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এপ্রিল ক্যাথরিন গ্লাসপাই দেশটির প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন এবং উপ প্রধানমন্ত্রী তারেক আজিজের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন যে কুয়েতের সাথে সীমান্ত বিরোধ ইরাক-কুয়েতের নিজস্ব বিষয় এবং এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন ভূমিকা থাকবে না। এটিকে সাদ্দাম হোসেন দেখেন কুয়েত দখলে আমেরিকার গ্রীন সিগন্যাল হিসাবে এবং তাঁর আরব শুভাকাঙ্খীদের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাতের এক সপ্তাহের মধ্যে ১৯৯০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর কুয়েত দখল করে নেন। তার সৈন্যরা কুয়েতে হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মত অপরাধ সংঘটিত করে। তিনি ভেবেছিলেন যে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকা যেমন তাকে সকল প্রকার সাহায্য সহায়তা করেছিল এবারও তা করবে। তাঁর ভুল ভাঙ্গতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকার নেতৃত্বে

বহুজাতিক বাহিনী জাতিসংঘের ম্যান্ডেট নিয়ে ইরাক আক্রমণ করে দেশটিকে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়, ইরাকের হাত থেকে রক্ষার অজুহাতে সৌদি আরবে মার্কিন সেনা ঘাটি স্থাপন করা হয় এবং সউদী সরকারকে বাধ্য করা হয় তার যাবতীয় খরচ বহন করতে। সাদ্দামের কুয়েত দখল আরবদেরকে যত ক্ষতি করেছে অন্য কোন ঘটনা ততো ক্ষতি করতে পারে নি। এ ঘটনার ফলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে তার আমেরিকা তার সামরিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। অবশেষে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্র থাকার মিথ্যা অভিযোগে আমেরিকা ইরাক দখল করে নেয় এবং সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুৎ করে।

বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলীতে এবং তাতে কয়েকটি দেশের কুটনীতিকদের খোলামেলা হস্তক্ষেপের কারণে একই ধরণের একটি আশংকার বিষয় উড়িয়ে দেয়া যায় না। গত কয়েক মাসে আমাদের রাজনীতিতে রিমোট কন্ট্রোল শব্দটি খুব বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমরা আমাদের রাজনীতির রিমোট কন্ট্রোল বুঝে হোক আর না বুঝে হোক ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে এমন সব দেশের কুটনীতিকদের হাতে তুলে দিচ্ছি যে দেশগুলো ছিল সাদ্দাম ট্রাজেডির মূল নায়ক। নীচে এর কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হলঃ

১. প্রায় তিন বছর আগে একটি বিদেশী দূতাবাস থেকে তৃতীয় শক্তি তত্ব ছুড়ে দেয়া হয়েছিল। রাজনীতিকদেরকে ব্যর্থ আখ্যায়িত করে বলা হয়েছিল যে তারা এভাবে ব্যর্থ হতে থাকলে দেশে 'তৃতীয় শক্তি' রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে। এর পরপরই জঙ্গী উত্থান ঘটেছিল। বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র আখ্যা দেয়া হয়েছিল। এ নিয়ে বিদেশেও প্রচারণার বন্যা বয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা, সংবিধান ও গণতন্ত্রকে বিপন্ন করা এবং রাষ্ট্রের স্তম্ভগুলোকে দুর্বল করার প্রক্রিয়া এর মাধমে শুরু হয়েছিল।

২. বাংলাদেশে বিদেশী হস্তক্ষেপের বিষয়ে সুশীল সমাজের ভূমিকা সম্ভবতঃ সবথেকে বেশী প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। একমাত্র সুশীল সমাজের স্বঘোষিত প্রতিনিধিরাই সরাসরি বিদেশী অর্থে লালিত। ফলে তাদের দায়বদ্ধতা কেবলমাত্র বিদেশের কাছেই। বিদেশীদের অতি প্রিয়ভাজন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক কোন রাখঢাক না রেখেই বলেছিলেন যে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত যে তৃতীয় শক্তির ক্ষমতা দখলের কথা বলেছিলেন তা হচ্ছে সুশীল সমাজ। অনেকে বলছেন, সুশীল সমাজকে রাষ্ট্রক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তাদেরকে লিপ্ত করা হয়েছে দেশে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করতে যাতে রাষ্ট্রব্যবস্থার স্তম্ভগুলো নড়বড়ে হয়ে যায় এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্র তৈরী হয়। হয়তো এই কারণে এই বিশেষ গোষ্ঠীকে দেখা গেছে বাংলাদেশকে অকার্যকর প্রমাণ করার চেষ্টা করতে এবং বাংলাদেশের বিনিয়োগের পরিবেশ, ব্যবসা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে নেতিবাচক ও অসত্য প্রচারণা চালাতে। রাজনৈতিক সংকটের চরম পর্যায়ে এ ধরণেরই একজন সুশীল নেতা ড. কামাল হোসেন জাতীয় সরকারের তত্বও উপস্থাপন করেন।

৩. বুঝে হোক আর না বুঝে হোক আমাদের মিডিয়া বিদেশীদের হাতে দেশের রাজনীতির রিমোট কন্ট্রোল তুলে দিতে ভূমিকা রাখছে। পশ্চিমা কোন কূটনীতিকের দেখা পেলেই সাংবাদিকগণ এমনভাবে তাদের উপর হুমড়ী খেয়ে পড়ছেন এবং এমন সব প্রশ্ন করছেন যে মনে হবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উক্ত কূটনীতিকরাই নির্ধারণ করে দেন। বাংলাদেশে নির্বাচন হবে কিনা, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করবে কিনা, এমনকি কোন দল ক্ষমতায় আসবে - এ সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তাঁরা কূটনীতিকদের

কাছে ছুটে যান। কৌতুহলের বিষয় হচ্ছে যে, বিশ্বব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার তাঁদের একটি বড় অংশ বাংলাদেশে পরাশক্তির আধিপত্যকে প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। নিজ দেশের রাজনীতিক ও পেশাজীবিগণকে সাহসী ও কিছুটা বিব্রতকর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে যারা সাহসী সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি পেয়েছেন তাদেরকে কখনোই কূটনীতিকদেরকে এ ধরণের প্রশ্ন করতে দেখা যায় না, 'আপনার অমুক বক্তব্য ও কর্মকান্ড কি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল নয়?' উপরন্ত মিডিয়া সংশ্লিষ্টগণের অনেকে আকারে ঈঙ্গিতে বুঝিয়ে থাকেন যে কয়েকটি দেশের মন রক্ষা না করতে পারলে কোন দলই ক্ষমতায় যেতে পারবে না বা কোন সরকারই টিকে থাকতে পারবে না। এর ফলে বিদেশী আগ্রাসনের একটি মনস্তাত্বিক ক্ষেত্র তৈরী করা হচ্ছে।

৪. একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে পরাজয়ের পর অভিযোগ করেছিলেন যে তেল ও গ্যাস বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে রাজী না হওয়ায় তিনি জয়ী হতে পারেন নি। এ অভিযোগকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করলে মারাত্মক ভুল হতে পারে। একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর এ ধরণের অভিযোগ থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ

ক. নির্বাচনের পূর্বে কিছু দেশের কূটনীতিকগণ আমাদের প্রধান দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের নিকট থেকে তেল-গ্যাস দেয়ার মত বিষয়ে অঙ্গীকার নেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। নির্বাচনের পরেও তাদের স্বার্থরক্ষার বদলে সরকারের প্রতি সমর্থনের বিষয়টিও এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

খ. বিদেশী শক্তিগুলো দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে ভূমিকা রেখে থাকে। তাদের 'ভূমিকা' পালনে ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ সেই দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ যারা রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ছাড়াও মিডিয়া কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবির নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে।

গ. আমাদের শীর্ষ নেতাগণের অনেকেই মনে করেন যে জনগণ নয় বরং তাদের হার-জিত নির্ধারণ করে থাকে বিদেশী শক্তিগুলো। এ কারণে তাঁরা বিদেশীদের কাছে দেশের অভ্যন্তরীণ সকল বিষয় নিয়ে এমন সব অভিযোগ করে থাকেন যা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের হস্তক্ষেপকে আহ্বান করার শামিল। যেমন একটি সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশে গিয়ে অভিযোগ করা হল যে সরকার জঙ্গীবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ও সংখ্যালঘুদেরকে নির্যাতন করছে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান বন্ধ করে দেয়ার অনুরোধও জানানো হয়েছিল।

রাজনীতিকরা ক্ষমতায় যাবার জন্য কূটনীতিকদের হাতে রাজনীতির রিমোট কন্ট্রোল তুলে দেবার ব্যাপারে যে আর কোন রাখ-ঢাক করছেন না তার বড় প্রমাণ প্রধান দুই দলের মহাসচিবের মধ্যকার সংলাপ একটি বিদেশী রাষ্ট্রদূতের বাসায় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, আমাদের রাজনীতিকদের একটি বড় অংশ এবং তাদের সমর্থক মিডিয়া কর্মী ও বুদ্ধিজীবিগণ প্রকারান্তরে সাদ্দাম হোসেনের কৌশল অবলম্বন করেছেন। তারা ভাবছেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা বিদেশীদের ব্যবহার করছেন। সাদ্দাম হোসনেও একই রকম ভেবেছিলেন। তিনি যেমন বুঝতে পারেন নি যে একটি সুদূর প্রসারী চক্রান্তের তিনি ছিলেন ক্রীড়ানক মাত্র এবং কার্য সিদ্ধি হবার পর তাকেও নির্মমভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হবে, তেমনি বুঝতে পারছে না আমাদের রাজনীতিক, সুশীল সমাজ ও মিডিয়া।